বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট সমস্যা ও কয়েকটি সুপারিশ

মোঃ মাহমুদ হাসান*

The Man-Made Crisis in The Drainage System of The South-Western Region and Some Suggestions

Abstract

In this article it has been focused on numerous man-made interventions on natural flow of water of the South-Western rivers. Encroachers and land mongers have changed the nature and characteristics of these rivers by taking illegal possession over the rivers. Illegal human settlements have expanded towards the dried-up river beds at many places. Roads are being constructed on what once used to be rivers . Tanks are being dug and paddy is cultivated on the river beds here and there. All these things have made these rivers blocked, stagnant and turned them into narrow canals. This article attempts to explore the man-made problems, and provide suggestions to mitigate the problems.

ভূমিকা

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল প্রকৃতি প্রদত্ত নদী এবং অপর মাধ্যম হল কৃত্রিমভাবে খননকৃত খাল। আমাদের নদীবেষ্টিত বাংলাদেশের বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং উজান থেকে নেমে আসা পানি জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদী দ্বারা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। কিন্তু নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনে অপারগ হলে দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা ও বন্যা যার করুণ পরিণতি প্রাণহানি, ফসলহানি, দুর্ভিক্ষ, রোগবালাই, মহামারি, হাহাকার ইত্যাদি। বাংলাদেশের ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কথা আমাদের স্মৃতিতে এখনো জাগরুক রয়েছে যা এক ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের জন্ম দিয়েছিল। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরায় এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয় যা ছিল ঐ অঞ্চলের জন্য শতাব্দীকালের এক নজিরবিহীন ঘটনা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্রকায় নদীসমূহ প্রধানত মানবসৃষ্ট কারণে ঐ সময়ে পানি নিষ্কাশনে ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার এক মর্মান্তিক অভিশাপ বয়ে আনে। আলোচ্য নিবন্ধে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের ওপর মানবসৃষ্ট সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেইসাথে সমস্যাসমূহ সমাধানে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

প্রবন্ধ প্রণয়নের যৌক্তিকতা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ প্রধানত মানবসৃষ্ট নানা কারণে পানি নিষ্কাশন করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্হা মুখ থুবড়ে পড়ার কারণে ঐ অঞ্চলে ভবিষ্যতে বন্যা, দীর্ঘস্হায়ী জলাবদ্ধতা এবং সেইসাথে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে বলে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হওয়া দরকার। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে কৃত্রিমভাবে মানবসৃষ্ট ঘটনাগুলোর সমীক্ষা করা শুধু জরুরীই নয়, বরং অপরিহার্য। উপর্যুক্ত যৌক্তিকতার আলোকে আলোচ্য নিবন্ধ বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পদ্ধতি ঃ এ নিবন্ধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যার তালিকা নিবন্ধের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। নিবন্ধকার ঐ অঞ্চলের কয়েকটি নদীর গতিপথ স্বচক্ষে অবলোকন করে তাদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন যা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

পরিধি ঃ নিবন্ধে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বলতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভূমন্ডলীয় ব্যবস্থার অংশবিশেষ ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মূল মাধ্যম মাথাভাংগা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, বেতনা, ভদ্রা, বেগবতী, নবগংগা, চিত্রা প্রভৃতি নদীকে অন্তর্ভুক্ত করে এদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা ও গতিপথের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ঐ অঞ্চলে ২০০০ সালের বন্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধে ঐ অঞ্চলের মুখ থুবড়ে পড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর মানবসৃষ্ট কারণসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই সাথে সমস্যাসমূহের সমাধানে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতাঃ প্রবন্ধে সেকেন্ডারি তথ্য তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সকল নদীর ভৌগলিক গতিপথ সচক্ষে নিরীক্ষণ করা নিবন্ধকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণসমূহ নির্ধারণে জনমত জরিপের কোন প্রক্রিয়া এখানে অবলম্বন করা হয়নি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের পানি নিষ্কাশনের অসামর্থ্যতার ভৌগলিক কারণের বিশ্লেষণ প্রবন্ধে অনালোচিত রয়ে গেছে।

২০০০ সালের অচিন্তনীয় ও নজিরবিহীন এক বন্যাঃ সকলেই ছিলেন অপ্রস্তুত

অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা বলে পরিচিত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আকস্মিকভাবে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। অর্ধশতাব্দীর আগে এ অঞ্চলে একবার বন্যা দেখা গেলেও তার তান্ডব, ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতি

এ মহাপ্লাবনের তুলনায় ছিল যৎসামান্যই। ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবনে যেখানে বাংলাদেশ জলের উপর ভেসেছিল, ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশ রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, চরম সংকটকালীন সে সময়ও উক্ত অঞ্চল বন্যামুক্ত ছিল। সংগত কারণেই বন্যার সাথে এ অঞ্চলের মানুষের কোন পরিচয় নেই। প্রাকৃতিক নিরীক্ষণেও দেখা যায় এ অঞ্চলে নেই কোন উল্লেখযোগ্য বন্যাপ্রবণ নদী। এ অঞ্চলের ছোট ছোট নদী ভরাট হয়ে হাজামজা ও অনাব্য হয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে ২৫টিরও বেশী ক্ষুদ্র নদী ভরাট হয়ে গেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ সব ক্ষুদ্র নদীর উৎসধারার মুখে পশ্চিমবঙ্গে বাঁধ, ক্রসবাঁধ ও রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এক রকম নিরাপদ ও বন্যামুক্ত অঞ্চল বলে প্রতীয়মান হত। কিন্তু সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধেয়ে আসা অসময়ের প্রলংকরী বন্যা (সাধারণত বন্যার মওসুম হল জুন-সেপ্টেম্বর) একথা প্রমাণ করল যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বন্যামুক্ত বা নিরাপদ নয়, বরং ঘোরতর বন্যাপ্রবণ হতে পারে। মহাসাগরের প্লাবনের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বন্যার পানি হুহু করে মেহেরপুরে ঢুকল, তারপর একে একে চুয়াডাংগা, জীবননগর, দামুড়হুদা, আলমডাংগা, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, শার্শা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, মনিরামপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা, আশাশুনি, তালা, দেবহাটা, কালিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। অভিশপ্ত বানের পানিতে ডুবে গেল মাঠঘাট, শস্যক্ষেত, ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, রাস্তাঘাট সবকিছু। হতবিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আশ্রয় নিল ঘরের ছাদে, গাছের ডালে, মসজিদের ছাদে, কলার ভেলায়, বাঁধের উপর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উঁচু জায়গায়। প্রাণহানি হল অসংখ্য মানুষের, গবাদিপশুর; গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান। নষ্ট হয়ে গেল মাঠের ফসল, বিধ্বস্ত হল রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ, ঘরবাড়ি। বন্যার পানি অপেক্ষাকৃত দ্রুত না সরার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও ঐ সময় বিভিন্ন মহল থেকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ঃ ভূ-ভাগের শিলা গঠন ও পলল সঞ্চয়নের সময় অনুসারে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ব-দ্বীপীয় তলানী অঞ্চলের অন্তর্গত। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর পলি দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার (নদীসমূহের) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা হওয়ার কারণে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দুর্বলতার বিষয়টি এই সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। যেহেতু এ অঞ্চলের নিষ্কাশন ব্যবস্থাও নদীভিত্তিক তাই দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জনে ঐ অঞ্চলের নদ-নদীর গতিপথ বর্ণনা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহায়ক বিবেচনায় এদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মাথাভাংগা ঃ পদ্মার শাখা নদী। মুর্শিদাবাদ জেলার জলংগীরের কাছে উৎপন্ন হয়ে কুষ্টিয়ার ইনসাফনগরের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করে দৌলতপুর, ভেড়ামারা, আলমডাংগা, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর হয়ে পুনরায় চুয়াডাংগার নিকটে ভারতে গিয়ে চুর্ণনদীর সাথে মিশে ভাগিরথী নদীতে পড়েছে। বাংলাদেশ অংশের মাথাভাংগার সংস্কার প্রয়োজন, কারণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যার পানি মাথাভাংগা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ অংশের উৎসমুখে মাথাভাংগা নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ কিলোমিটার।

ভৈরব ঃ এককালের জীবন্ত ও তীর্থনদী বলে খ্যাত প্রায় ২৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব নদী পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার শ্রুতকীর্তির অপরপাড়ে জন্মলাভ করে প্রথমে জলঙ্গী নদীর সাথে মিশে পরে মেহেরপুরে বাংলাদেশে এসে মাথাভাংগার সাথে মিশেছে। পরে মাথাভাংগা হতে মুক্ত হয়ে চুয়াডাংগা, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, যশোর, ফুলতলা, দৌলতপুর হয়ে খুলনায় এসে রূপসা নদীতে পড়েছে। পরে রূপসা-পশুর হয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে। ভৈরবের দু'টো অংশ; উচ্চ ভৈরব ও নিম্ন ভৈরব। মেহেরপুর থেকে যশোরের বসুন্দিয়া পর্যন্ত নদীটি ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। এরপর থেকে নদীটি নাব্য। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যার পানি উচ্চ ভৈরব থেকে নিম্ন ভৈরবে নামতে পারেনি বলে ভৈরব অববাহিকায় বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ভৈরব নদী নাব্য থাকলে এ অঞ্চলের বন্যার পানি সহজে নিষ্কাশিত হত।

কপোতাক্ষ ঃ প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুবিখ্যাত কপোতাক্ষ নদী ভৈরব নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, তালা হয়ে খোলপেটুয়া নদীর সাথে মিশেছে। নদীটি সংস্কারের অভাবে যশোর অংশে অনাব্য হয়ে গেছে। ২০০০ সালের বন্যার পানি কপোতাক্ষ দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয়েছে। ভরাট ও অনাব্য হওয়ার কারণে এর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একে সংস্কার করলে বন্যার বিপদ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে।

বেতনা ঃ যশোরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে নাভারন, শার্শা ও কলারোয়া হয়ে চাপরার নিকটে মরিচচাপ নদীতে পড়েছে। শার্শা ও কলারোয়ার বন্যার পানি এ নদী দ্বারা আস্তে আস্তে নিষ্কাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে কোনরূপ সংস্কার না করায় নদীটি হাজামজা, ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। ফলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারেনি। এ নদীকে খননসহ সার্বিক সংস্কার করলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হবে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯২ কিলোমিটার।

ভদ্রা ঃ ঝিকরগাছার নিকটে কপোতাক্ষ নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে কেশবপুর অতিক্রম করে হরিপুর নদীর সাথে মিশে ভদ্রা নামে ডুমুরিয়া, দাকোপ হয়ে শিবশা নদীতে

পড়েছে। বর্তমানে ভদ্রা কপোতাক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন। কপোতাক্ষের সাথে পুনরায় ভদ্রার সংযোগ স্থাপন করা গেলে কপোতাক্ষের অর্ধেক পানি ভদ্রা দিয়ে নিষ্কাশিত হবে। ভদ্রা নদী সংস্কার করা তাই অপরিহার্য হয়ে পবেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯০ কি.মি.।

চিত্রা ঃ চুয়াডাংগা ও দর্শনার মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়ে কালিগঞ্জ, শালিখা, কালিয়ার ভিতর দিয়ে প্রায় ১৩০ কি. মি. প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটের নিকটে নবগংগার সাথে মিশেছে। পরে এটি দৌলতপুরে এসে ভৈরবে পড়েছে। নদীটি উৎপত্তির স্থান হতে শালিখা পর্যন্ত ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যার পানি চিত্রা নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হতে না পারায় মেহেরপুর ও চুয়াডাংগার বন্যা স্থায়িত্ব পেয়েছে। সুতরাং চিত্রা নদী সংস্কার করা গেলে পশ্চিমাঞ্চলের পানি চিত্রা দিয়ে নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

নবগংগা ঃ চুয়াডাংগা শহরের নিকটে মাথাভাংগা থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝিনাইদহ জেলা অতিক্রম করে মাগুরা শহরের কাছে কুমারের সাথে মিশে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হয়ে লোহাগড়া ও কালিয়া অতিক্রম করে গাজীরহাটের কাছে চিত্রার সাথে মিশেছে। মিলিত স্রোতধারা দৌলতপুরে ভৈরব নদীতে পড়েছে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০ কি.মি.। লক্ষ্যণীয়, চুয়াডাংগার পূর্ব দিকে এসে নবগংগার পথ রূদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে মাথাভাংগার বন্যার পানি নবগংগায় নামতে পারেনি বলে বন্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

কুমার ঃ চুয়াডাংগা জেলার হাটবোয়ালিয়ায় মাথাভাংগা হতে উৎপন্ন হয়ে নবগংগার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে মাগুরায় এসে নবগংগায় পড়েছে। বর্তমানে কুমারের উৎসমুখ বন্ধ থাকার কারণে নদীটি অনাব্য হয়ে গেছে। কুমার নদীকে মাথাভাংগা নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হলে চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা অঞ্চলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারবে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪ কি.মি.।

বেগবতী ঃ চুয়াডাংগা জেলা শহরের কাছে মাথাভাংগা থেকে উৎপন্ন হয়ে বিষয়খালী আড়পাড়া হয়ে শালিখায় এসে চিত্রা নদীতে পড়েছে। উৎসমুখ হতে ঝিনাইদহ পর্যন্ত নদীটি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে বেগবতী দ্বারা পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে না। এর নাব্যতা বজায় থাকলে উক্ত অঞ্চলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারত। বেগবতীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের বাস্তব অবস্থা

কোন কালেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মাথাভাংগা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, কোদলা, নবগংগা, চিত্রা, বেগবতী, ভদ্রা, কুমার, ফাটকী প্রভৃতি নদী খনন ও সংস্কার করা হয়নি। এ অঞ্চলে বন্যা না হওয়ার কারণে এসব নদীর সংস্কারের দাবীও জোরেশোরে ওঠেনি। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যা যখন প্রাণঘাতি, প্রলয়ংকরী ও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল তখন বিভিন্ন মহল থেকে

এদের খননসহ সার্বিক সংস্কার করার দাবী উঠল। এসব নদীর অনেকাংশই অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিয়ে তাদের কেউ চাষাবাদ করছে, কেউ দালানকোঠা নির্মাণ করেছে, কেউ পুকুর খনন করে মাছ চাষ করছে। আবার কোথাও দেখা যাবে নদীবক্ষ বা নদীতীর অবৈধভাবে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, কোথাও নদীবক্ষে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, অথচ সেখানে প্রয়োজন ছিল ব্রীজ। ফলে এসব নদী তাদের স্বাভাবিক প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের মানবসৃষ্ট কারণ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা ও বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের সাক্ষাৎ কারণ মানবসৃষ্ট । যখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার কোন আলামতই নেই তখন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সকল নদীর বাঁধ ওরা রাতারাতি খুলে দিলে উক্ত অঞ্চলে বন্যার পানি অতিদ্রুত চলে আসে এবং গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশের সাথে এ ব্যাপারে কোন পূর্ব আলোচনা করেনি বলে বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলের মানুষ বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এবং দ্রুত আশ্রয়স্থানে যেতে পারেনি। যখন বন্যার পানি এল তখন আর তা নদী দ্বারা সমগতিতে নিষ্কাশিত হতে পারল না। কারণ ঐ অঞ্চলের নদীগুলোর পানি নিষ্কাশনযোগ্যতা ছিল না। পানি নিষ্কাশনযোগ্যতা না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের ওপর মানুষের বিরূপ আচরণ ও অত্যাচার। যে অঞ্চলে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে কোন ভয়ংকর বন্যা দেখা দেয়নি সে অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যা এল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বন্যা এসেছে যা পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু বন্যার পানি কেন নিষ্কাশিত হয়নি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের বিবেচনায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ নিম্নরূপ যার অধিকাংশই মানবসৃষ্ট।

এক) নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হওয়া

প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহ ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও নদীতে বাঁধ দিয়ে এর গতিপথ বন্ধ করা হয়েছে। অবৈধ দখলদাররা তাদের ইচ্ছেমতো নদী দখল করে নদীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বদলে দিয়েছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ রুদ্ধ হওয়ার কারণে বন্যার পানি সাগরাভিমুখে নিষ্কাশিত না হতে পেরে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নেয়।

দুই) বিল-বাঁওড় ও নীচু এলাকার সাথে নদী বা খালের সংযোগহীনতা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ বিল-বাঁওড় ও নীচু এলাকার বদ্ধপানি খাল বা নদীর দ্বারা নিষ্কাশিত না হবার কারণে পানি জমে স্থায়ী পানিবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া বিদ্যমান খালসমূহ সংস্কারের অভাবে বন্যার পানি বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

তিন) অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে ঐ অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট তৈরী, নদী বা খালের উপরে বাঁধ নির্মাণ, ক্রসবাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির কারণে পানির স্বাভাবিক নিম্নগামী প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং বন্যা দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করে।

চার) চিংড়ি ঘের তৈরী

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলায় অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র চিংড়ি ঘের তৈরী করার কারণে কোথাও কোথাও খাল ও নদীর গতিপথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও খাল ও নদী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলে বেতনা ও কপোতাক্ষসহ অন্যান্য নদী দ্বারা বন্যার পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পাঁচ) নদীতে মৎস্য পুকুর তৈরী

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত ভৈরব নদী দ্বারা (উচ্চ ভৈরব) মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা অঞ্চলের বন্যার পানি কপোতাক্ষ নদীতে পড়েছে কিন্তু এর মূলধারার যে অংশ যশোর, অভয়নগর, ফুলতলা, দৌলতপুর, হয়ে খুলনায় পড়েছে সে অঞ্চলের ভৈরবে (নিম্ন ভৈরব) বন্যার পানি এক ফোঁটাও আসেনি। কারণ, যশোর অঞ্চলের ভৈরব নদীর অধিকাংশ স্থানে পুকুর তৈরী করে মৎস্য চাষ করা হয়েছে। ফলে ভৈরব নদী আর নদী নেই, পুকুরে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভৈরব নদীর উপর রাস্তা তৈরী করে এর গতিপথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অবৈধ দখলদাররা একে গ্রাস করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভৈরব মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে ২০০০ সালের বন্যার পানি যদি যশোরের মূল ভৈরবে (নিম্ন ভৈরব) নামতে পারত তাহলে বন্যা এত ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী হত না।

ছয়) চিত্রা নদীর সংযোগহীনতা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অপর বিখ্যাত নদী চিত্রার সাথে উচ্চ ভৈরবের সংযোগ না থাকার কারণে মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা অঞ্চলের পানি চিত্রা নদীতে আসতে পারেনি। ফলে ঐ অঞ্চলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত না হয়ে দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করে।

বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও পানি নিষ্কাশনে মানবসৃষ্ট সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুপারিশঃ

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদীর ওপর মানুষের অবিমৃষ্য ও বিধ্বংসী কার্যকলাপের কারণে ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ নাব্যতা হারিয়ে পানি নিষ্কাশনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে দেখা দিল ২০০০ সালের বন্যার প্রাদুর্ভাব, সাথে সাথে পানি নিষ্কাশনহীনতা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা। এমতাবস্থায় দক্ষিণবাহী নদীসমূহের বর্তমান করুণ অবস্থাকে সামনে রেখে মানবসৃষ্ট পানি নিষ্কাশনহীনতা দূরীকরণার্থে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ

করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশ ভাটির দেশ বিধায় বন্যার সম্ভাবনা থেকেই যাবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন সমস্যার প্রেক্ষাপটে বন্যা প্রতিরোধসহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচ্য হতে পারে।

প্রথমতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহ খনন ও সংস্কার করাঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ খননসহ সার্বিক সংস্কার করে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, নদী প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নদীর কোন বিকল্পই নেই। নদী দ্বারা পানি নিস্কাশিত হলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণবাহী নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনের অযোগ্য হওয়ার কারণেই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত ঃ নদী ও খালের উপর থেকে অবৈধ ও জবরদখলদারিত্বের অবসান ঘটানঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার পানি নদী দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, নদী আমাদের অকৃত্রিম ও পরম বন্ধু। সুতরাং নদীর প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তার উপর কোন জবরদখল বা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করা চলবে না।

তৃতীয়ত ঃ নদীর চলার স্বাধীনতা দান করাঃ নদীর চলার অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার চলার পথে কোন বাধা আরোপ করা যাবে না। বিশেষ করে নদীর উপর আড়াআড়ি রাস্তা তৈরি করে তাকে রুদ্ধ করা যাবে না। ২০০০ সালের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার ক্ষেত্রে দেখা গেল বন্যার পানি নদী দ্বারা দ্রুত সরে না যাওয়ার কারণে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হল। বন্যার পানি ভৈরব, মাথাভাংগা, কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, প্রভৃতি নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হয়েছে। কিন্তু এ সব নদী ভরাট হাজামজা, অপ্রশস্ত, অনাব্য ও মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার কারণে পানি বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ফলে বন্যার পানি নীচে নামতে না পেরে দু'কূল ছাপিয়ে সমতল ভূমি গ্রাস করে ও বন্যা স্থায়ী বিপদ হিসেবে দেখা দেয়। কৃত্রিমভাবে খাল কেটে পানি নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুবই কঠিন ও ব্যয়বহুল, সেহেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যমান মৃতপ্রায় নদীগুলো খননসহ সার্বিক সংস্কার করে পানিবহনযোগ্য ও নাব্য করে তোলা দরকার।

চতুর্থত ঃ খাল খনন ও সংস্কার করে নদীর সাথে সংযোগ দেয়া ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যে সব নীচু এলাকা ও বিল- বাওড়ে বন্যার পানি জমা হয়ে বন্যা স্থায়ীত্ব লাভ করল সে সব বিল- বাওড় ও নীচু এলাকা থেকে কৃত্রিম খাল কেটে পার্শ্ববর্তী নদীর সাথে সংযোগ করে দিলে পানি সহজেই নিষ্কাশিত হয়ে যাবে এবং পানিবদ্ধতা দেখা দেবে না। প্রয়োজনে বিদ্যমান খালসমূহের সংস্কার করে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

পঞ্চমত ঃ পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ ও ক্রসবাঁধ নির্মাণ

পানি যাতে জমে না থাকে সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রেখে রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ ও ক্রসবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। এর ফলে অতিবৃষ্টি বা বন্যার পানি আটকে থাকবে না, জলাবদ্ধতাও দেখা দেবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিল ডাকাতিয়ায় যে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে অপরিকল্পিতভাবে ভেড়িবাঁধ ও নদীতে স্লুইচ গেট নির্মাণ। ভেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেট নির্মাণের ফলে নদীর পানি বিল ডাকাতিয়ায় প্রবেশ না করার কারণে বিলের তলদেশ পূর্ববৎ গভীর থেকে যায়, অপরদিকে নদীতে পানি জমে থেকে এর তলদেশ ভরাট হয়ে যেতে থাকে। ফলে বৃষ্টির পানি বিলে জমা হয়ে থাকে, নদী তা আর ধারণ করতে পারে না। এভাবে ভেড়িবাঁধ তৈরী ও নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কারণে "বিল ডাকাতিয়া" লাখ লাখ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং নদীতে ক্রসবাঁধ, স্লুইচ গেট, বাঁধ বা ভেড়িবাঁধ তৈরীর ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেই তা করতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ নদীতে পুকুর তৈরী বন্ধ করা

নদীতো নদীই। তার গতিপথ বন্ধ করে তাতে পুকুর তৈরী করা যাবে না। বিশেষতঃ ভৈরব, কপোতাক্ষ, বেতনা প্রভৃতি নদীর ওপর কৃত্রিমভাবে মৎস্য পুকুর তৈরী করা যাবে না। পুকুর তৈরী করে এদের গতিপথ বন্ধ করা হয়েছে বলে বন্যার পানি নীচে নামতে পারেনি। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থে নদীর ওপর মৎস্য পুকুর তৈরী ও ইজারা দেয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

সপ্তমত ঃ চিংড়িচাষ নিয়ন্ত্রণ করা

যেহেতু বিশেষ করে সাতক্ষীরা অঞ্চলে যত্রতত্র নদী ও খালের ভিতরে চিংড়ি ঘের করে খাল ও নদীপথ বন্ধ করা হয়েছে, তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐ সকল নদী বা খালকে যথার্থ অর্থেই উন্মুক্ত করতে হবে; সেখানে চিংড়ি চাষ করা যাবে না। প্রয়োজনে নতুন খাল খনন করা যেতে পারে।

অষ্টমত ঃ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সকল খাল ও নদী থেকে সকল ধরনের অবৈধ স্থাপনা ও দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে হবে। আর এজন্য উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা দরকার। নদী থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হলে নদীর বিদ্যমান অবস্থাও থাকবেনা, অচিরেই সম্পূর্ণ নদীগ্রাস সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নবমত ঃ দেশপ্রেম জাগ্রত করা ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলা

শুধু কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, গ্যাস, ময়লা, আবর্জনা ও বর্জ্যই যে পরিবেশ দূষিত করে তাই নয়; খাল ও নদী দখল, তাতে অবৈধ স্থাপনা তৈরী, তাদের গতিপথ বন্ধ করা, অপরিকল্পিত চিংড়িঘের তৈরী, নদীতে মৎস্যপুকুর তৈরী করা

ইত্যাদি কারণে যে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিণতিতে বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা যত না প্রাকৃতিক, তার চেয়ে মানব সৃষ্ট নানা কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। একদিকে, গংগা বা পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখা হিসেবে দক্ষিণাভিমুখী প্রবাহিত ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ পশ্চিমবঙ্গে বাঁধ নির্মাণের কারণে পানিশূন্যতায় ও পানি ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছে। ফলে স্রোতহীন এসব নদী হাজামজা ও অনাব্য হয়েছে। অপরদিকে মানবসৃষ্ট কারণে এগুলো আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এগুলোর বাস্তব অবস্থা এই যে, আইনের তোয়াক্কা না করেই অবৈধ দখলদাররা এসব নদী দখল ও গ্রাস করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ করে এর অস্তিত্বনাশ করার সকল আয়োজন করা হচ্ছে। নদীবক্ষ ও নদীতীর দখল করে ধান চাষ বা মৎস্য চাষ করা হয়েছে, চিংড়ি ঘের তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে প্রতিরোধহীনভাবে। ফলে নদ-নদীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় নদীর প্রতি অন্যায় ও অবিবেচনাপ্রসূত মানব আচরণের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায়। মানবসৃষ্ট এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে, সচেতন হতে হবে এবং বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।। **এদের প্রবাহমান** করার স্বার্থে **এদের বুকের ওপর থেকে সকল বাধা অপসারণ করতে হবে, সকল বাঁধ কেটে দিতে হবে; যেখানে ব্রীজ প্রয়োজন সেখানে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে। মোট কথা নদীকে জীবন্ত ও উন্মুক্ত করতে যা যা করা দরকার তা করতে হবে। আর এগুলো আমাদের বাঁচার তাগিদেই শুধু নয়, আমাদের অনাগত প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্যও এটা করতে হবে।** সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশন করার স্বার্থে ঐ অঞ্চলের সকল নদীকে উন্মুক্ত করার দরকার বিধায় নদীকে অবৈধ দখলমুক্ত করা আশু জরুরী এবং পরবর্তীতে নদী খননসহ সংস্কার করার প্রয়োজন। বৃহত্তর এ প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণকে জড়িত করার পাশাপাশি সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তবে সর্বদলীয় রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস ও দেশপ্রেম যুক্ত না হলে নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনযোগ্য করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা, জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং রাজনৈতিক দলসমূহের সত্যিকার সদিচ্ছা একান্তভাবে জরুরী।

তথ্য সহায়তা

১। সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা ঃ ৮ অক্টোবর ২০০০।

২। দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ঃ ১৩ অক্টোবর ২০০০।

৩। দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ঃ ১৭ অক্টোবর ২০০০।

৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ১৯ অক্টোবর ২০০০।

৫। ভোরের কাগজ, ঢাকা ঃ ১৯ অক্টোবর ২০০০।

৬। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ঃ ২১ অক্টোবর ২০০০।

৭। জীবনের জন্য নদী ঃ হ্যাগার্ট, কেলি (অনূদিত ঃ শরফুদ্দীন, আবদুল্লাহ আল-মুতী, সাহিত্য প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৬।

৮। বাংলাদেশের নদী ঃ আজহারুল হক, সৈয়দ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ ঃ হাসান, মাহবুব, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১০। বাংলাদেশের নদীমালা ঃ আব্দুল ওয়াজেদ, প্রকৌশলী; ঢাকা, ১৯৯১।

১১। যশোর জেলার ইতিহাস ঃ আসাদ, আসাদুজ্জামান; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ঢাকা, ১৯৮৯।

১২। সুন্দর বনের ইতিহাস ঃ আব্দুল জলিল, এ, এফ, এম; আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৬।